

## হুটপুটকরণ গরুর খামারে জীবনিরাপত্তা (ইরডংবপ্পং)

ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী, এসও

### বায়োসিকিউরিটি

বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তা হল এমন কিছু কৌশল ও সমন্বিত প্রয়াস যা কোননির্দিষ্ট এলাকার ভিতরে বা আশে পাশে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর অনুপ্রবেশ বিস্তার এবং ঐ স্থানে পালিত প্রাণীর কোন রকম সংক্রামন ঘটানো অথবা বিপদগ্রস্ত করা থেকে বিরত রাখে।

### বায়োসিকিউরিটি বা খামারে জীবনিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে খামারে রোগের সংক্রমন ঘটতে পারে-

#### ক) মানুষের অসচেতনতা

খামারে মানুষের যাতায়াত, কৌতুহল, অজ্ঞতা, বেখেয়াল অথবা লাভের চিন্তায় খামারে অন্য কর্মকাণ্ড (বিনোদন ব্যবস্থা) অনেক সময় খামারের জীব নিরাপত্তা বিনষ্ট করে।

#### খ) প্রতিবেশী খামার

প্রতিবেশী রোগক্রান্ত খামার থেকে প্রয়াসই রোগের সংক্রামন ঘটে থাকে। এক খামার থেকে অন্য খামার নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

#### গ) কর্মরত জনবল

খামারে বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক লোকজনের দরকার হয়। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে এই সকল কর্মী অনেক সময় রোগ ছড়াতে পারে।

#### ঘ) আরোগ্য লাভকারী ছাগল

রোগ থেকে আরোগ্য লাভকারী ছাগল বাহ্যিকভাবে সুস্থ মনে হলেও অনেক সময় তাদের শরীরে রোগের জীবাণু থেকে যেতে পারে। ফলে সুস্থ ছাগল ঐ সকল ছাগলের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।

#### ঙ) খাদ্য

খাদ্য জীবাণুমুক্তভাবে সংগ্রহ পরিবহন ও সংরক্ষণ এবং পরিবেশন না করা হলে খাদ্যের মাধ্যমেও অনেক জীবাণু ছাগলকে আক্রমন করতে পারে।

#### চ) পানি

পানির মাধ্যমে বেশীর ভাগ সময় জীবাণুর সংক্রামিত হয়। পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের সময় জীবাণুর সংস্পর্শে আসা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

#### ছ) বন্য প্রাণী এবং পাখি

এই সকল প্রাণী খামারে রোগ সংক্রমনের অন্যতম প্রধান কারন। এরা এক খামার থেকে অন্য খামারে আমাদের অজান্তে রোগের বিস্তার ঘটায়।

#### জ) বিক্রির জন্য বাজারে নেওয়া

খামারী বিক্রির জন্য অনেক সময় গরু বাজারে নেয়। বাজারে নেয়া গরু অন্য অচেনা গরু সংস্পর্শে আসে। কিন্তু বিক্রি না হলে পুনরায় খামারে ফিরিয়ে আনা হয়। বাজারে গরু সহ বিভিন্ন প্রাণীর রোগ বিস্তারের জন্য উপযুক্ত স্থান। গরু চড়ে বেড়ানোর সময় যদি কোন অচেনা গরু অথবা গ্রামে বা খামারে অজানা উৎসের গরুর সংস্পর্শে আসে তবে পিপিআর, গোটপক্স সহ অন্যান্য মারাত্মক সংক্রামক রোগ খামারে ছড়াতে পারে।

#### ঝ) গরুর ঘর

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পর্যাপ্ত জায়গাসহ গরুর জন্য ঘর তৈরী করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর ঘর ও অপরিষ্কার স্থান বিভিন্ন রোগের জীবাণু ঘরে বেঁচে থেকে রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। অনেক সময় এই ধরনের বাসস্থান গরুকে পীড়ন (ঝংঝং) এ ফেলে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রমনে সহায়তা করে।

## সুস্থ/অসুস্থ গরু চেনার উপায়, হুস্টপুস্ট গরুর পরজীবি নিয়ন্ত্রণ ও ভ্যাকসিন সিডিউল

### সুস্থ গরু চেনার উপায়

- ১। গবাদি পশু তৃপ্তি সহকারে খাবে এবং জাবর কাটবে। ২। মুখমন্ডল ও নাসারন্ধ্র ভেজা থাকবে। ৩। দুধের পরিমাণ কমবেশী হবে না। ৪। গরুর গায়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৮.৫ ডিগ্রী সেলসিয়া ৫। গোবর হালকা শক্ত ও কালো সবুজাভ রংয়ের। ৬। মূত্র পরিষ্কার হবে এবং খড়ের রংয়ের হবে।

### অসুস্থ গরু চেনার উপায়

- ১। দল থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং দুর্বল ও অমনোযোগী দেখা যায়। ২। জাবর কাটবে না। ৩। জ্বর আসবে। ৪। চোখ লাল হয়ে যাবে এবং চোখ দিয়ে পানি বারবে। ৫। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। ৬। দুধের গুণগত মান ও পরিমাণ পরিবর্তন হবে। ৭। গোবরে হজম না হওয়া খাদ্যের উপস্থিতি থাকবে।

### পরজীবি জনিত রোগ সমূহ ও এর প্রতিকার

গবাদি পশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে পরজীবি জনিত রোগ সমূহ খুবই ক্ষতিকর। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই পরজীবি জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পরজীবির বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে বাংলাদেশের গবাদিপশুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। এই রোগের কারণে প্রতি বৎসর অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। গবাদিপশুতে পরজীবির ডিম বা লার্ভা খাদ্যের সাথে বা দেহ ত্বক ছিদ্র করে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অনেক সময় পশু জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভফুলের মাধ্যমেও আক্রান্ত হতে পারে। এই পরজীবির পশুদের জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর। এরা পশুর দেহের রক্ত খায়, গৃহীত পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায়, এছাড়া পরোক্ষভাবেও এইসব পরজীবি বিভিন্ন পরিপাকযোগ্য খনিজ শুষে নেয়। এর ফলে পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগে পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপকারী অনুজীব ধ্বংস না করে পরজীবির ধ্বংস সাধনই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

### প্রয়োগ পদ্ধতি

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরজীবি নাশক ভাল ঔষধ বাজার থেকে নির্বাচিত করে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে বাজারে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এইসব কৃমিনাশক ঔষধ বাজারজাত করে থাকে। কৃমিনাশক ব্যবহারের সর্বোত্তম ফল পেতে হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পশুর ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। দুইটি কৌশলগত মাত্রা প্রত্যেকটি পশুর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি শীতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) অন্যটি বর্ষার শুরুতে (মে-জুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

### কৃমি রোগ প্রতিরোধের কর্মপন্থাসমূহ

- ১। পরজীবি বহুল এলাকায় সকল গবাদিপশুকে সর্বাঙ্গিক চিকিৎসা দিতে হবে।
- ২। নিয়মিতভাবে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার বর্ষার প্রারম্ভে (মে-জুন মাসে) এবং শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) গবাদিপশুকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ৩। জলজ স্যাঁতস্যাঁতে এলাকার গবাদিপশুকে চড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৪। পরজীবির আক্রমণাত্মক লার্ভা দূরীকরণে কাটা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ ভালভাবে ধৌত করতে হবে। খড় বা সাইলেজ তৈরী করে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫। রৌদ্রজ্বল সকালে মাঠে বা অন্য এলাকায় একসাথে গবাদিপশু চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬। বাংলাদেশের যে সব এলাকায় ব্যাপক পরজীবি আক্রমণের আশংকা আছে সেখানে গবাদিপশু আবদ্ধভাবে পালন করা যেতে পারে।

৭। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপশুর গোবর সৎকার করতে হবে।

৮। গবাদিপশুর ফার্মের পাশে বা গ্রামে যে সকল জলাবদ্ধ এলাকা রয়েছে সেখানে গবাদিপশু চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

### উপকারিতা

বেশীরভাগ কৃমিনাশকই ব্যয়বহুল নয়। পশুতে কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে তা পশুপালনকারীর জন্য খুবই সুফল বয়ে আনে। দেখা গেছে ব্যয়ের তুলনায় লাভের আনুপাতিক হার ১ঃ১০ অর্থাৎ কোন কৃষক যদি কৃমিনাশকের জন্য ১ টাকা ব্যয় করে তবে সে দুধ ও মাংস বাবদ ১০ টাকা আয় করবে। পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নাই বরং কৃমিনাশক পরিবেশকে পরজীবি মুক্ত রেখে পশু ও মানুষকে পরজীবি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

### সংরক্ষণ ও সতর্কতা

সঠিক মাত্রায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে এর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এটা মানুষের জন্য একটি বিষাক্ত ঔষধ।

সুতরাং অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

### কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

পরজীবি মুক্তকরণ এই কৌশলটি নিয়মিতভাবে প্রয়োগের ফলে পশুর দেহে পরজীবি ধ্বংস হওয়ার কারণে পশুদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়- যা কৃষকের প্রাশিড়ক আয়কে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে কৃষকের আয় রোজগার থেকে জীবন যাত্রার মান উন্নত হওয়ার মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও সুদৃঢ় করে।

| কৃমিনাশকের নাম | মাত্রা                                |
|----------------|---------------------------------------|
| এন্ডেক্স       | ১টি ট্যাবলেট / ৭৫ কেজি দৈনিক ওজন      |
| এন্ডোকিল       | ১টি ট্যাবলেট / ৭৫ কেজি দৈনিক ওজন      |
| এলটি-ভেট       | ১টি ট্যাবলেট / ৭৫ কেজি দৈনিক ওজন      |
| লিভানিড        | ১টি ট্যাবলেট / ১০০-১৫০ কেজি দৈনিক ওজন |
| ভারমিক         | ১মিলি / ৫০ কেজি দৈনিক ওজন             |
| আইভোমেক        | ১মিলি / ৫০ কেজি দৈনিক ওজন             |

### গরুর বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

| রোগ       | ১ম টিকা<br>প্রদানের বয়স | পরিমাণ                 | প্রয়োগ স্থান   | পুনঃপ্রয়োগ  | সংরক্ষণ<br>তাপমাত্রা | সংরক্ষণের<br>মেয়াদ |
|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| ক্ষুরারোগ | ৬০ দিন<br>৪ মাস          | ট্রাইভ্যালেন্ট- ৬ সিসি | চামড়ার<br>নিচে | ৬ মাস পর পর  | ৪-৮° সেঃ             | ৩-৬ মাস             |
| বাদলা     | ৬ মাস                    | ৫ সিসি                 | চামড়ার<br>নিচে | ৬ মাস পর পর  | ৪-৮° সেঃ             | ৬ মাস               |
| তড়কা     | ৬ মাস                    | ১ সিসি                 | চামড়ার<br>নিচে | ১ বৎসর পর পর | ৪-৮° সেঃ             | ৬ মাস               |
| গলাফুলা   | ৭ মাস                    | ২ সিসি                 | চামড়ার<br>নিচে | ৬ মাস পর পর  | ৪-৮° সেঃ             | ৬ মাস               |
| জলাতংক    | যে কোন বয়স              | ৩ সিসি                 | মাংসে           | ১ বৎসর পর পর | -২০-০° সেঃ           | ১ বৎসর              |

### হুস্তপুষ্ট গরুর সংক্রামক রোগসমূহ ও এর প্রতিকার

আমাদের দেশে গরু বিভিন্ন রোগ থাকলেও তার মধ্যে কয়েকটি রোগের নাম এবং তাদের জীবাণুর নামসহ নিচে ছক আকারে দেওয়া হল এবং এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি রোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

#### ১. ক্ষুরারোগ

ক্ষুরারোগ বিভক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট পশুর অত্যন্ত তীব্র প্রকৃতির ছোঁয়াচে ভাইরাস জনিত রোগ। জ্বর, মুখ ও পায়ে ফোঁসকা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষুরারোগের কারণে বিপুল পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়।

#### লক্ষণ

প্রথমে জ্বর হয় এবং মুখ, পা ও দুধের বাটে রসভরা ফোঁসকার সৃষ্টি করে। খাদ্য গ্রহণের ফলে মুখের ভেতরে ও জিহ্বার ফোঁসকা ছিড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ফলে মুখ থেকে প্রচুর লালার বার, দুই পায়ের ক্ষুরের মাঝে ক্ষত সৃষ্টি হয়। রোগ নির্ণয়

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ যেমন জ্বর, মুখ দিয়ে লালার বার, মুখ ও পায়ে ফোঁসকা, খোঁড়ানো। সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ের জন্য এলাইজা, পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাস সনাক্তকরণ।

#### চিকিৎসা

- জীবাণুনাশক দ্বারা মুখ ও পায়ের ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে।
- ক্ষুরারোগ জীবাণুর জটিলতা রোধে অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনামাইড ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত পশুকে শুকনো ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে এবং নরম বা তরল খাবার দিতে হবে।

#### নিয়ন্ত্রণ

- ৬০ দিন বয়সে প্রথম টিকা এর দুই মাস পর বুস্টার দিয়ে প্রতি ৬ মাস পর পর এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। কোন এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশী থাকলে প্রতি ৪ মাস পর পর টিকা দেওয়া উচিত।
- রোগাক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করতে হবে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মৃত পশুকে গভীর গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। কোনক্রমেই খোলা মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।

## ২. তড়কা রোগ

তড়কা বা অ্যানথ্রাক্স রোগ ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (ইধপরষয়ং ধহঃযৎধপরং) নামক স্পোর তৈরি করে এমন একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট পশুর একটি অতিতীব্র প্রকৃতির মারাত্মক জুনোটিক রোগ। রোগটি পশু থেকে মানুষে ছড়াতে পারে এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ সৃষ্টি করে। মানুষ সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসা বা মাংস, চামড়া বা অন্যান্য উপজাত নিয়ে কাজ করার সময় এরোগে আক্রান্ত হতে পারে

### রোগের লক্ষণ

স্বাভাবিক অবস্থায় এ রোগের সুপ্তিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়না। তবে ১-২ সপ্তাহ ধরা হয়।

ক) অতি তীব্র প্রকৃতি (চবৎধপঃব ভড়ৎস)

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের আগে মারা যায়,
- কখনও কখনও ১-২ ঘন্টা স্থায়ী হয়

খ) তীব্র প্রকৃতি (অপঃব ভড়ৎস)

- জ্বর (১০৪°দ-১০৭°দ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, পেট ফাঁপা, গর্ভপাত, দেহের কাঁপুনি, বৃষ্মেনের গতি কমে যায়, নাক, মুখ, প্রশ্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায় ও শরীরের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত ক্ষরণ হয়

### রোগ নির্ণয়

গবাদিপশুর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ প্রদর্শিত উপসর্গ দেখে এরোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে এরোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশুর কানের রক্ত ও স্থানিক এডিমার তরল নিয়ে কাচের স্লাইডে স্মেয়ার করে অল্প তাপে ফিক্সড করে ১% পলিক্রম মিথিলিন ব্লু এবং গ্রামস স্টেইন দ্বারা রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করলে গ্রাম পজেটিভ দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়ে। পলিক্রম মিথিলিন ব্লু স্লাইডে এ রোগের জীবাণু আকাশী বর্ণের এবং তার চারপাশে ক্যাপসুল দানাদার রেড পারপল বর্ণের দেখায়।

মৃত পশুর বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখেও রোগ সনাক্ত করা যায় যেমনঃ

- এরোগে মৃত পশুর দ্রুত পঁচন আরম্ভ হয় ও পেট ফাঁপা থাকে।
- দেহের স্বাভাবিক ছিদ্র পথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাধে না।

### চিকিৎসা

তড়কা রোগের চিকিৎসায় এন্টিসিরাম ও এন্টিবায়োটিক ভাল কাজ করে। এন্টিসিরাম পাওয়া গেলে ১০০-২৫০ মিলি হিসেবে প্রতিটি আক্রান্ত পশুতে প্রত্যহ শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। তবে একই সময়ে এন্টিসিরাম ও এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন অধিক কার্যকর। পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ প্রতি কেজি দৈনিক ওজনের জন্য ১০,০০০ ইউনিট করে মাংস পেশীতে দিনে দুইবার করে ৫ দিন ইনজেকশন দিতে হয়।

### নিয়ন্ত্রণ

রোগাক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক রেখে চিকিৎসা ও সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। মড়কের সময় পশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পালন করতে হবে। আক্রান্ত পশুকে যথাযথ চিকিৎসা ও সুস্থ পশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধে বর্ষার শুরুতে ১ মিলি টিকা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে এবং প্রতিবছর একবার করে প্রয়োগ করতে হবে।

খামারী প্রাণিসম্পদ অফিসে খবর দিয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এ রোগে মৃত পশুর দেহ কাটা ছেড়া করা উচিত নয় তাতে করে জীবাণু ছড়িয়ে যেতে পারে। মৃত পশু ও পশুর শরীর থেকে নির্গত রক্ত ও মল, মূত্র গভীর গর্ত করে চুন সহকারে পুতে ফেলতে হবে। পরে পশুর আবাস স্থল ১০% ফরমালডিহাইড দিয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

### ৩. বাদলা রোগ

বাংলাদেশে পশুর এরোগ বৃষ্টি বাদলের দিনে হয় বলে একে বাদলা রোগ বলে। প্রধানত এরোগে পা আক্রান্ত হয় তাই একে ব্লাক লেগ বলে। ক্রিস্টিডিয়াম শোভিয়াই জীবানু দ্বারা সৃষ্টি। এরোগ প্রধানত বাড়লুড়ত বয়সের পশুর একটি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ।

#### লক্ষণ

এ রোগের সুপ্তিকাল ১-৭ দিন। অতি তীব্র ও তীব্র এই দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। মৃত্যু আকস্মিক না হলে ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর (১০৪-১০৭° ফাঃ), পেটে গ্যাস, নাকে শে- আ, অবসাদভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। উপসর্গ প্রকাশের ১২-৩৬ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতির রোগে অতি তীব্র প্রকৃতির ন্যায় উপসর্গ ছাড়াও পায়ের মাংশ পেশী আক্রান্ত হয়। ফলে পশু হাটতে পারে না এবং খুড়িয়ে হাটে। আক্রান্ত মাংশপেশী কিছু ফোলা থাকে এবং টিপলে পচপচ শব্দ হয়। উপসর্গ প্রকাশের ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে। বেচে যাওয়া পশুর মাংসে পচন ধরে এবং খসে পড়ে এবং সম্পূর্ণ ভাল হতে ১-২ মাস সময় লাগে।

#### রোগ নির্ণয়

- প্রধানত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়স্ক গরু আক্রান্ত হয়। এ রোগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ হল জ্বর, খোড়ানো এবং আক্রান্ত পেশী টিপলে পচপচ শব্দ
- সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্ষতস্থানের পেশী নিডিল দিয়ে ছিদ্র করে ফুইড নিয়ে স্মিয়ার গ্রামস স্টেইন ক রলে গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে।

#### চিকিৎসা

প্রতিকেজি দৈহিক জন্মের জন্য ১০,০০০ আই ইউ পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে হয়। প্রথমে ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন শিরায় ইনজেকশন দিয়ে পরবর্তী মাত্রার প্রোকেইন পেনিসিলিন অর্ধেক মাত্রায় আক্রান্ত পেশীতে এবং মাংশপেশীতে দিনে দুইবার করে ৫-৭ দিন ইনজেকশন দিতে হবে।

#### নিয়ন্ত্রণ

তিন মাসের বেশী বয়সী গরুর বর্ষার শুরুতে ত্বকের নিচে ৫মিলি টিকা দিলে ১৪ দিনে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিকরে।

### ৪. গলাফোলা

গলাফোলা গবাদিপশুর বিশেষ করে মহিষের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ইংরেজীতে এই রোগটিকে বলা হয় ঐধবসডুৎৎযধমরপ বাবড়ঃরপবসরধ। এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ এবং এ রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশী। বর্ষাকালেই গলাফোলা রোগের সংক্রমণ বেশী দেখা যায়। রোগ কারণ চধংঃৎবযযধ গঁযঃডপরফধ গুতব-১ নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হয়ে থাকে।

#### সংক্রমণ

সাধারণত পশুর উর্দ্ধ শ্বাসতন্ত্রে এই রোগের জীবানু থাকে, পশু যদি কোন কারণে পীড়নের সম্মুখীন হয় যেমন, অধিক গরম, ঠান্ডা, ভ্রমনজনিত দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে এই রোগের জীবানুর বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং রোগ দেখা দেয়। গলাফোলা রোগে আক্রান্ত পশুর লালা, মলমূত্র এবং উকুন/আঠালীর মাধ্যমে এই রোগটি ছড়াতে পারে।

#### লক্ষণ

হঠাৎ করে দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফা.)। গলার নীচের অংশ ফুলে যায় এবং হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। ফুলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পশু খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়, শ্বাস-

প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়, নাক-মুখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হয়। অনেক সময় জিহবা ফোলে যায়, জিহবা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। রোগ খুবই তীব্র প্রকৃতির হলে পশু ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

#### চিকিৎসা

লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারেঃ ওটেন্ট্রো ভেট ইনজেকশন-প্রতি ১০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য ১০-২০ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে অথবা এসাইপিলিন ইনজেকশন- প্রতি ১০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য ২-৭ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে অথবা স্ট্রেপটোপেন ইনজেকশন- প্রতি ১০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য ৫-৭ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি ইনজেকশন ২৪ ঘন্টা পরপর ৩-৫ দিন প্রয়োগ করতে হবে। উপরোক্ত যে কোন ঔষধের সাথে হিসটা-ভেট ইনজেকশন ৫-১০ মিলি দিনে ২-৩ বার মাংসে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

#### প্রতিকার

রোগের সংক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটি পশুকে শীতের শুরুতে গলাফোলা টিকা (ঐ. বা. ঠাধপপরহব) দিতে হবে।

#### বিভিন্ন ধরনের রোগসমূহ জন্য টিকা প্রদান নির্দেশিকা

| টিকা      | জানু      | মার্চ | এপ্রিল | নভেম্বর | ডিসেম্বর  |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|-----------|
| ক্ষুরারোগ | ক্ষুরারোগ |       |        |         | ক্ষুরারোগ |
| তড়কা     |           | তড়কা |        |         |           |
| বাদলা     |           |       | বাদলা  |         |           |
| গলাফুলা   |           |       |        | গলাফুলা |           |

গৰু হুষ্টপুষ্টকৰণে খাদ্যে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, এণ্টিবায়োটিক ও হৰমোন ব্যৱহাৰে প্ৰাণী ও জনস্বাস্থ্যৰ উপৰ  
ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ

হৰমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক বলতে কি বুঝায়: একপ্ৰকাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যা বিভিন্ন শাৰীৰবৃত্তীয় কাজেৰ প্ৰভাৱক হিসেবে ব্যৱহৃত হয় প্ৰচলিত হৰমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক এৰ নাম:

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| ডেক্সামিথাসন |  | এস্ট্ৰাডায়ল |
| টেস্টোস্টেৰন |  | প্ৰজেস্টেৰন  |
| বিটামিথাসন   |  | ইস্ট্ৰোজেন   |
| প্ৰেডনোসোলন  |  | এণ্ড্ৰোজেন   |

প্ৰাণী দেহেৰ উপৰ হৰমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যৱহাৰেৰ প্ৰভাৱ:

- চলাফেৰা ধীৰ গতিসম্পন্ন
- মূত্ৰক্ৰিয়া ক্ষতিগ্ৰস্থ হয়
- কিডনী ও লিভাৰ কাৰ্যক্ৰম ব্যাহত হয়
- স্বাভাৱিক শ্বসনক্ৰিয়া ব্যাহত হয়
- প্ৰাণীমৃত্যু ও ঘটতে পাৰে

মানবস্বাস্থ্যৰ উপৰ প্ৰভাৱ:

- স্থূলতা
- উচ্চ ৰক্তচাপ
- ক্যান্সাৰ
- হাৰ্ট ডিজিজ
- কিডনীৰ কাৰ্যক্ৰম ব্যাহত হয়